[illegible]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

[illegible]:

আল্লাহ তাআলা কুরআনী শরীয়ত তথা ইসলামী শরীয়তের হিফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এই শরীয়ত হল সর্বশেষ শরীয়ত। আল্লাহ সে শরীয়তের হিফাযতের দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।
বিজ্ঞ লোকেরা জানেন যে, শুধু কুরআন-সুন্নাহই নয়, কুরআন-সুন্নাহকে বোঝা যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল সেগুলোকেও আল্লাহ তাআলা পূর্ণরূপে হিফাযত করেছেন। তদ্রূপ, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার বিন্যাস ও সংকলনের জন্য যে শাস্ত্রগুলোর সূচনা, সেগুলোকে ও সেগুলোর বুনিয়াদী গ্রন্থগুলোকেও আল্লাহ হিফাযত করেছেন।

আজ শত শত বছর পরও ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফিকহ ইত্যাদি শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থগুলো আমাদের কাছে ঠিক সেভাবেই সংরক্ষিত আছে যেভাবে এ গ্রন্থগুলো রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। কপিকার ও মুদ্রাকরের বেখেয়ালতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের জন্যও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যার ভিত্তিতে ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধিত হওয়ার ধারাবাহিকতা প্রতি যুগেই অব্যাহত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

প্রত্যেক শাস্ত্রের বুনিয়াদী গ্রন্থগুলো সে শাস্ত্রের ধারক বাহক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পঠন-পাঠন-আলোচনা এবং এ গ্রন্থকেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমাদৃত ছিল এবং রচিত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ‘তাওয়াতুর’ ও ‘ইস্তিফাযাহ’র মাধ্যমে চলে এসেছে।
গ্রন্থগুলোর বিশুদ্ধ ও নির্ভেোগ্য মাখতুতাত (হস্তলিখিত কপি) বিশেষজ্ঞদের সামনে রয়েছে। মুদ্রনযন্ত্রের প্রচলনের পর থেকে গ্রন্থগুলো মুদ্রিত হয়ে পাঠকের সামনে আসছে। আজও যদি কোনো প্রকাশক এ জাতীয় গ্রন্থাদির প্রকাশনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে না পারেন এবং কোনো বুনিয়াদী গ্রন্থকে একাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাখতুতাহ (হস্তলিখিত কপি) থেকে কিংবা অন্তত এমন একটি মাখতুতাহ থেকে যা বিশেষজ্ঞদের কাছে নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ, না ছেপে থাকেন তবে এর প্রতিবাদ করার মতো এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশ করার মতো আত্মমর্যাদাশালী আলিম ও প্রকাশক এখনো বিদ্যমান রয়েছেন।
মোটকথা, শুধু কুরআন-সুন্নাহই নয়; বরং কুরআনী শরীয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহের বুনিয়াদী গ্রন্থগুলোকেও আল্লাহ হিফাযত করেছেন। আর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, যে যুগে যে কেউ এগুলোর যথাযথরূপে সংরক্ষিত থাকার বিষয়টিকে সংশয়যুক্ত করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করেছেন।

বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের দুশমনদের বিভিন্ন প্রচারণায় অবচেতনভাবে প্রভাবিত হয়ে কিছু গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধু একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। প্রশ্নটি এই যে, ফিকহে হানাফীর সনদ কী এবং ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদী কিতাবগুলো যাদের রচনা বলে প্রসিদ্ধ, এগুলো যে তাদেরই রচনা তার প্রমাণ কী?

এই প্রশ্ন শুনে আমার সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠেছে। কেননা এই একই প্রশ্ন আগামীকাল কেউ ফিকহে মালেকী সম্পর্কে করবে না, ফিকহে শাফেয়ী বা ফিকহে হাম্বলী সম্পর্কে করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? শুধু তাই নয়, এই প্রশ্ন ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, এবং অন্য সকল ইসলামী শাস্ত্র সম্পর্কে করবে না তার নিশ্চয়তা কী? বরং ইসলামের দুশমনেরা তো এ জাতীয় প্রশ্ন অনেক আগে থেকেই করে আসছে।

একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোনো ইসলামী শাস্ত্রের যেকোনো গ্রন্থ, যা বিশেষজ্ঞদের মাঝে সমাদৃত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য উৎসরূপে বরিত, তার বিষয়ে এধরনের প্রশ্ন উথ্থাপন করা কত বড় মূর্খতা ও গোমরাহীর পরিচায়ক।

যাহোক, প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন সেটা ভিত্তিহীন হলেও সাধারণ মুসলিম জনগণকে এর বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রশ্নটির প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছে। এজন্য আমার কিছু বন্ধুর অনুরোধে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে নিন্মোক্ত আলোচনা পত্রস্থ করা হল। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমার কিছু সুহৃদ আমাকে আগেও প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মৌখিকভাবে যে কথাগুলো তখন পেশ করেছিলাম সে কথাগুলো দিয়েই প্রবন্ধটি শুরু করছি।

একটি আলোচনা
আমার সেই বন্ধুগণ বিভিন্ন সময় আমাকে বলেছেন যে, গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের আমাদের উপর প্রায়ই একটি প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়। প্রশ্নটি এই যে, আপনারা ইমাম আবু হানীফা রহ. –এর তাকলীদ করে থাকেন, কিন্তু আপনারা কি কখনো যাচাই করে দেখেছেন, আপনাদের কিতাবের মাসআলাগুলো ইমাম আবু হানীফা বলেছেন কি না? , আপনারা মাসআলা সংগ্রহ করেন ফতোয়া শামী থেকে। এই কিতাবের লেখক ইবনে আবেদীন শামী হলেন হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি, তার মৃত্যুসন ১২৫২ হিজরী। আপনাদের মাদরাসায় ফিকহের কিতাব ‘কানযুদ দাকাইক’ পড়ানো হয়। এর লেখক হলেন আবুল বারাকাত নাসাফী, যার মৃত্যুসন ৭১০ হিজরী। তাহলে তাকে অষ্টম শতাব্দীর লেখক বলা যায়। এরপর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে কিতাবটি আপনাদের মাদরাসায় পড়ানো হয় তা হল ‘হিদায়া’। এর রচয়িতা আবুল হাসান মারগীনানী; ইনি ৫৯২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা রহ. ইন্তেকাল করেছেন ১৫০ হিজরীতে। তাহলে ষষ্ঠ, অষ্টম বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো ব্যক্তি যদি সনদ ছাড়া ‘আবু হানীফা বলেছেন’ বলে উদ্ধৃতি দেন, তাহলে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? যেখানে ইমাম আবু হানীফা ও উপরোক্ত গ্রন্থকারদের মাঝে শত শত বছরের ব্যবধান, সেখানে তাদের সনদবিহীন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কোনো কথাকে কীভাবে আবু হানীফার কথা বলা যেতে পারে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, ‘রদ্দুল মুহতার’ কে ইবনে আবেদীন শামীর কিতাব বলে থাকেন, ‘কানযুদ দাকাইক’কে আবুল বারাকাত নাসাফীর কিতাব এবং ‘হিদায়া’কে আবুল হাসান মারগীনানীর কিতাব বলে থাকেন এবং এই কিতাবগুলোর মাসায়েল উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং তাদের সূত্রে ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে যুক্ত করে থাকেন। প্রশ্ন হল আবু হানীফা তো দূরের কথা ওই রচয়িতাদের পর্যন্ত কোনো সনদও কি আপনাদের কাছে রয়েছে? আমার সেই বন্ধুরা বলেছেন, যেহেতু অনেক গায়রে মুকাল্লিদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন আজকাল খুব প্রচারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন লিফলেট ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে এ প্রশ্ন ছড়ানো হচ্ছে, তাই এবিষয়ে একটি বিশদ প্রবন্ধ আলকাউসারে আসা উচিত।

আমি তাদেরকে মৌখিকভাবে এটুকু বলেছি যে, আপনারা গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদেরকে আদবের সাথে জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের মতে ফিকহে হানাফীর তাকলীদ অনুচিত হওয়ার কারণ কি এই যে, এখানে উল্লেখিত মাসায়েল ইমাম আবু হানীফা থেকে সনদের সঙ্গে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ রয়েছে? যদি এই সন্দেহ দূর হয়ে যায় তাহলে আপনারা ফিকহে হানাফীর তাকলীদ সঠিক বলবেন? যদি বিষয়টি এমন হয়, তাহলে আপনাদের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া ফলদায়ক হতে পারে। যদিও আমাদের ধারণা হল, উপরোক্ত প্রশ্ন ভুল হওয়ার বিষয়টি আপনাদেরও ভালোভাবেই জানা আছে। তবুও আমরা এই প্রশ্নের জবাব পেশ করতে প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি বিষয়টি এমন না হয়; বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্যই হল একটি অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসংবদের সূচনা করা, তাহলে এ জাতীয় প্রশ্নগুলো হাদীসের ভাষায় ‘উগলূতাত’ এর অন্তর্ভূক্ত হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হাদীস শরীফে তাকীদ করা হয়েছে। এজন্য অন্তত আপনাদের পক্ষে এ জাতীয় প্রশ্ন উথ্থাপন করা এবং সমাজে ছড়ানো কখনো শোভা পায় না।

আমি তাদেরকে একথাও বলেছি যে, আপনারা গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কেন জিজ্ঞেস করেন না, ভাই, আমরা এবং আপনারা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ, এবং আরো বহু হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকি। তদ্রূপ তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তাবারী এবং আরো অনেক তাফসীরগ্রন্থ থেকে তাফসীরসংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করে থাকি। কিন্তু আপনারা কি কখনো এসব ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন তুলেছেন যে, শত শত বছরের প্রাচীন এই গ্রন্থগুলোর গ্রন্থকারদের পর্যন্ত আমাদের সনদটি কী এবং তা কোন মানের?

তাছাড়া দেখুন, লোকেরা ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ কিতাব থেকে হাদীস উল্লেখ করে থাকে এবং সে কিতাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতি মোতাবেক লিখে থাকে – বুখারী, আবু দাউদ, বায়হাকী ইত্যাদি, কিংবা আপনারা শায়খ আলবানীর কিতাব পড়ে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে তার উল্লেখিত উদ্ধৃতি মোতাবেক লিখে থাকেন- বুখারী (২৫৬ হি.), মুসলিম (২৬১ হি.), আবু দাউদ (২৭৫ হি.),
তিরমিযী (২৭৯ হি.), দারাকুতনী (৩৮৫ হি.), বায়হাকী (৪৫৮ হি.), ইবনে হাযম (৪৫৬ হি.), ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) ইত্যাদি। কিন্তু আপনারা কি ভেবেছেন যে, মিশকাত গ্রন্থকার যিনি অষ্টম শতাব্দীর একজন ব্যক্তি, ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) প্রমুখ তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিসদের পর্যন্ত তাঁর সনদ কী? আলবানী সাহেব যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ, তৃতীয় শতাব্দী, চতুর্খ শতাব্দী এবং পঞ্চম শতাব্দীর উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের পর্যন্ত তাঁর সনদ কী? এরপর বলুন, মিশকাতের কোনো হাদীসের উপর আমল করার জন্য কিংবা আলবানী সাহেবের কোনো উদ্ধৃতিকে স্বীকার করার জন্য কি তাদের উদ্ধৃত কিতাবসমূহ খুলে উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতা যাচাই করা এবং নিজে সনদের মান পরীক্ষা করা অপরিহার্য? আপনারা কি মনে করেন যে, উপরোক্ত কাজ ছাড়া কোনো আলেম তো দূরের কথা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেও তাদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করা যাবেনা?

‘মিশকাতুল মাসাবীহ’-তে সনদ উল্লেখ না থাকলেও সনদযুক্ত কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি রয়েছে, কিন্তু মাসাবীহুস সুন্নাহ কিতাবে তো সনদও নেই, সনদওয়ালা কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি নেই।অথচ শত শত বছর ধরে গ্রন্থটি উম্মাহর মাঝে পঠিত হচ্ছে এবং এগ্রন্থের হাদীস মোতাবেক আমলও করা হচ্ছে।সবাই আস্থাশীলতার সাথেই কিতাবটির হাদীস বর্ণনা করছেন। চিন্তা করে দেখুন, এ কিতাবের উপর নির্ভর করে হাদীস বয়ান করার অর্থ কি এই যে, বাস্তবেও এই হাদীসগুলোর কোনো সনদ নেই?

আমি আমার বন্ধুদেরকে বলেছি, আপনারা তাদের বিবেকের কাছে এ প্রশ্নও রাখবেন যে, আজ আপনারা বিভিন্ন ভিত্তিহীন প্রশ্নের অবতারণা করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে কিতাব-সুন্নতের ব্যবহারিক পদ্ধতি ‘ফিকহে মুতাওয়ারাস’ (খায়রুল কুরুন থেকে ধারাবাহিকভাবে উম্মাহর মাঝে সমাদৃত ফিকহ) সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করছেন এবং নিজেদেরকে যেনো ফিকহ অস্বীকারকারীদের কাতারে শামিল করছেন। আপনারা কি ভেবে দেখেছেন, আমাদের সমাজে আরেকটি দল আছে যারা নিজেদেরকে ‘আহলে কুরআন’ বা এ জাতীয় কোনো চটকদার নামে পরিচিত করে, তারাও ঠিক একই ধরণের প্রশ্ন, যা আপনারা ফিকহ সম্পর্কে করেছেন, হাদীস সম্পর্কে করে থাকে,এবং মানুষকে হাদীস-সুন্নত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার অপপ্রয়াসের মাধ্যমে নিজেদেরকে ‘হাদীস অস্বীকারকারীদের’ অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর ওয়াস্তে ভাবুন, কুরআনের নাম নিয়ে হাদীস অস্বীকার করা আর হাদীসের নাম নিয়ে ফিকহ অস্বীকার করার মধ্যে নীতিগত কিংবা কৌশলগত কোনো পার্থক্য আছে কি না?

এই কথাগুলো আরজ করার পরও আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, এ বিষয়ের মূল কথাগুলো কিছুটা শিদ আকারে লিখুন, যাতে এ ধরনের ভিত্তিহীন প্রশ্নের মাধ্যমে কেউ হাদীস-তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি সম্পর্কেও বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং ফিকহ-ফতওয়া বা কোনো দ্বীনী ইলম ও ফনের স্বীকৃত কিতাবাদি সম্পর্কে

মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে। তাদের অনুরোধে আল্লাহর উপর ভরসা করে ইচ্ছা করেছি যে, এ বিষয়ের কিছু জরুরি ও মৌলিক কথা পাঠকদের সামনে পেশ করবো।

সকল শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি
কোনো গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কি না এবং গ্রন্থটি যার লিখিত বলে পরিচিত বাস্তবেই তার লিখিত কি না তা জানার দু’টি পদ্ধতি রয়েছে ।

প্রথম পদ্ধতি এ যে, সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ধারক-বাহক ও পারদর্শীগণ যদি সেটিকে তাদের শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন, গ্রন্থটিকে ঐ লেখকের গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেন এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন তাহলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, গ্রন্থটি (সার্বিক বিচারে) নির্ভরযোগ্য এবং সেটির গ্রন্থকার পরিচিতি নির্ভুল।

পারিভাষিক শব্দে এভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থটি ঐ লেখকের হওয়ার বিষয়টি ‘তাওয়াতুর’ কিংবা অন্তত ‘শুরহত’ ও ‘ইস্তেফাজাহ’র পর্যায়ে উন্নীত হলে এবং গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ‘মুতালাক্কা বিল কাবূল’ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হলে তার নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রন্থকার-পরিচয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে।

এ পদ্ধতিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের যোগসূত্র প্রমাণিত হলে এ প্রশ্নের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না যে, আমাদের কাছে গ্রন্থকার পর্যন্ত কোনো ‘সনদ’ আছে কি না কিংবা সে ‘সনদের’ মান কী?

তবে একথার অর্থ এই নয় যে, দ্বীনী ইলম ও ফনের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের সনদ সংরক্ষিত নেই। আলহামদুল্লিাহ এ ধরনের কিতাবসমূহের সনদ এখনো সংরক্ষিত আছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ।

এখানে মনে রাখার বিষয় এই যে, এ ধরনের কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে ‘সনদের’ চেয়েও শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান রয়েছে, যার পারিভাষিক নাম হল ‘তাওয়াতুর’ ও ‘তালাক্কী বিল কাবূল’।

সুতরাং এই অকাট্য দলীল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সনদ খোঁজার প্রয়োজন থাকেনা। এজন্য হাদীস বিশারদগণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, এধরনের গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে সনদ তালাশ করা মূল কাজ নয়, এখানে মূল কাজ হল, গ্রন্থটির যে কপি আমাদের ব্যবহারে রয়েছে তা বিশুদ্ধ কি না যাচাই করা।

কপির বিশুদ্ধতা কীভাবে প্রমাণিত হয় তার স্বতন্ত্র নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে এবং তা আহলে ইলমদের জানা আছে। এ বিষয়ের জ্ঞান লাভের সহজ পদ্ধতি এই যে, কপিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত কি না এবং তারা সার্বিক বিচারে একে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেন কি না তা জেনে নেওয়া।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এ যে, আমাদের যুগ পর্যন্ত কিতাবটির ‘সনদে মুত্তাসিল’ সূত্র বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ স্বয়ং গ্রন্থকার থেকে তার শিষ্যগণ সরাসরি পড়ে, শুনে কিংবা ইজাযত নিয়ে কিতাবটি সংগ্রহ করেছেন। এরপর এই ধারাবাহিকতা এভাবেই অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। এক্ষেত্রেও কপির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করা অপরিহার্য।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটিই অধিক শক্তিশালী এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এজন্য হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কোনো গ্রন্থের গ্রন্থকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের পর কিংবা ঐ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার পর গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ বা ‘সূত্র’ সন্ধান করা কিংবা সেই কিতাব থেকে কোনো হাদীস, কোনো মাসআলা বা কোনো তথ্য বর্ণনা জন্য এ সূত্র অপরিহার্য মনে করা একেবারেই ভুল। এ কথা আহলে ইলমের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কেননা, সকল ইলম ও ফনের প্রাচীন গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। তবুও আমি পাঠকবৃন্দের মনের প্রশান্তির জন্য চারজন ইমামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

১. ইমাম আবু ইসহাক ইসফিরাঈনী (৪১৮ হি.)
জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. লিখেছেন, ইমাম আবু ইসহাক ইসফিরাঈনী এ বিষয়ে সকল ইমামের ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, যে গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের আস্থা অর্জন করেছে, তা থেকে তথ্যাদি উদ্ধৃত করা বৈধ। এর জন্য গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদভিত্তিক সংযুক্তি জরুরি নয়। হাদীস ও ফিকহ, উভয় বিষয়ের গ্রন্থাদির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রজোয্য।– তাদরীবুর রাবী ১/১৫১

২. ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৮৫২ হি.)
ইনি সহীহ বুখারীর সর্বোত্তম ও বিশুদ্ধতম ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’র বিখ্যাত রচয়িতা। তিনি লিখেছেন-‘যে গ্রন্থগুলো (শাস্ত্রজ্ঞদের মাঝে) প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত (যেমন সুনানে নাসায়ী) তা গ্রন্থকার থেকে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঠক থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই। - আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ১/২৭১

৩. ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দিস সালাম (৬৬০ হি.)
ইনি ফিকহ, হাদীস ও তাফসীর ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়েও ইমাম পর্যায়ের মনীষী। তিনি লিখেছেন, ‘ফিকহের যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কপি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ একমত। কেননা, বর্ণনাসূত্র (সনদ) দ্বারা যে নিশ্চয়তা লাভ হয় তা এই পদ্ধতিতেও লাভ হয়ে থাকে (বরং তার চেয়েও দৃঢ়ভাবে)। এজন্যই মানুষ নাহব লোগাত ও অন্যান্য ইলম ও ফনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করে থাকেন (এবং গ্রন্থকার পর্যন্ত বর্ণনাসূত্রের সন্ধান প্রয়োজন মনে করেন না) এখন যে মনে করে যে, সকল মানুষ বিভ্রান্তিতে রয়েছে তিনি বিভ্রান্তিতে থাকা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

‘মোটকথা, যে বলে কোনো বিশুদ্ধ কপি বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করতে হলে গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ বা সূত্র বিদ্যমান থাকতে হবে সে ইজমা-বিরোধী।’- তাদরীবুর রাবী ১/১৫২, আল আজবিবাতুল ফাযিলাহ, আব্দুলহাই লাখনোভী ৬০-৬৪; তাওজীহুন নযর, তাহির জাযাইরী ২/৭৬৫-৭৭২

৪. ইমাম ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হি.)
ইনি হাদীস, ফিকহ ও উসূলের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। তিনি তার কিতাব ফাতহুল কাদীরে (১/৩৬০) লিখেছেন, ‘ইমামে মাযহাব থেকে কোনো মাসআলা বর্ণনা করতে হলে তার দু’টি পদ্ধতি রয়েছে। এক. ইমাম থেকে মাসআলাটি সনদসহ বর্ণনা করা। দুই. মাসআলাটি ফিকহের কোনো প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক পঠিত গ্রন্থ (যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যক্তিবর্গের কাছে সমাদৃত) তা তেকে গ্রহণ করা। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. –এর রচনাবলি এবং অন্যান্য মুজতাহিদের প্রসিদ্ধ রচনাবলি। কেননা এই গ্রন্থগুলো প্রসিদ্ধির কারণে এবং ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ‘খবরে মুতাওয়াতির’ বা ‘খবরে মশহুর’- এর পর্যায়ে উন্নীত। ইমাম আবু বকর রাযী আল জাসসাস রহ. ও আলফুসুল ফিল উসূল (৩/১৯২)-এ এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। এরপর ইবনুল হুমাম (রহ.) লেখেন যে, ‘মারগীনানী (৫৯২ হি.) কৃত ‘হিদায়া’ এবং সারখসী (৪৮২ হি.) কৃত ‘আলমাবসূত’ উপরোক্ত ধরনের প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত গ্রন্থাদির অন্তর্ভূক্ত।’

উপরোক্ত স্বীকৃত নীতির আলোকে পাঠকবৃন্দের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, ত্বহাবী শরীফ, দারাকুতনী, ইবনে আবদিল বার-এর তামহীদ, ইস্তেযকার, মিশকাত শরীফ, মাসাবীহুস সুন্নাহ বাগাভী, বায়হাকী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাব, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, রূহুল মাআনী, তাফসীরে তাবারী এবং অন্যান্য তাফসীরের কিতাব, তাহযীবুত তাহযীব, মীযানুল ইতিদাল, তাহযীবুল কামাল এবং অন্যান্য আসমাউর রিজালের কিতাব, বাদায়েউস সানায়ে, শরহে বিকায়া, কানযুদ দাকাইক, আদদুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, (ফতওয়ায়ে শামী) ফাতাওয়া আলমগীরী এবং অন্যান্য ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাব যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত এগুলো থেকে হাদীস, তাফসীর কিংবা কোনো ফিকহী মাসআলা বর্ণনা করার জন্য এগুলোর রচয়িতাদের পর্যন্ত সনদ ও সনদের মান বিষয়ে খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা বিশেষজ্ঞদের কাছে এই কিতাবগুলো সমাদৃত হওয়াই সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রন্থকারের পরিচয় বিশুদ্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ‘তাওয়াতুর’ও ‘ইজমা’র মতো দলীল দ্বারা কোনো বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর ভিন্ন কোনো দলীল তালাশ করার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? উপরন্তু এমন দলীল বা সনদ যা ‘সহীহ’ ও ‘মুত্তাসিল’ হলেও সর্বোচ্চ ‘খবরে ওয়াহিদ’-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমি একথাটি আগেও বলেছি যে, এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির রচয়িতাদের পর্যন্ত ‘সনদ’ও আলহামদুল্লিাহ আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে এবং নমুনা হিসেবে একটি সনদ এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

সনদের দ্বিতীয় পর্যায়
এবার শুধু এ আলোচনাটুকু রইল যে, হিদায়া, কানয ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতাদের কাছে আইম্মায়ে মাযহাব-ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শাইবানী প্রমুখের বয়ানকৃত মাসায়েল কোন সূত্রে পৌঁছেছে? উপরের আলোচনা থেকেও এ বিষয়টি অনুমান করে নেওয়া সম্ভব তবুও কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১. যাদের মধ্যে তাহকীকের যোগ্যতা নেই তাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, যেহেতু এগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাব তাই এখানে যে কথাগুলো আইম্মায়ে ফিকহের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে তা নিশ্চিত হয়েই বলা হয়েছে। অতএব এই উদ্ধৃতি সঠিক।

কোথাও দু এক মাসআলায় ইমামগণের মাসলাক বর্ণনা করতে কোনো ভুল হয়ে গেলেও তা ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারগণ যত্নের সাথে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ফিকহের শিক্ষক ও ফতোয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলদের এ বিষয়ে সম্যক অবগতি রয়েছে। এজন্য এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়া বা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রশ্নই আসতে পারে না।

২. এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বিষয় রয়েছে। একটি হল কোনো কথার সনদ না থাকা আর অপরটি হল সনদ উল্লেখিত না হওয়া। এই দুই বিষয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাইরে মাকাল্লিদ ভাইরা এই পার্থক্যের দিকেও ভ্রুক্ষেপ করেন না। তারা যখন কুদুরী, শরহে বিক্বায়া, কানয ইত্যাদি কিতাবে ‘সনদে’র উল্লেখ দেখতে না পান তখন বলতে শুরু করেন যে, দেখ, দেখ, এই মাসআলাগুলোর কোনো সনদ নেই। এ বিষয়টি এমনি হল

যেন কেউ মুহিউস সুন্নাহ বাগাভীর প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব 'মাসাবীহুস সুন্নাহ'-তে উল্লেখিত হাদীসগুলোকে শুধু এজন্য সনদহীন বলে দিল যে, মাসাবীহ কিতাবে হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু যদিও মাসাবীহ কিতাবে হাদীসের সনদ উল্লেখিত হয়নি কিন্তু বাগাভী রহ. যে উৎস গ্রন্থগুলো থেকে মাসাবীহ কিতাবের জন্য হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সেখানে প্রত্যেক হাদীসের সাথে সনদ উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে কোনো কিতাবে যদি সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে এবং সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে সনদ উল্লেখ না করা হয় তবে কি তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, কথাটির আদৌ কোনো সনদ নেই? বাস্তবে সনদ না থাকা আর কোনো কারণে সনদ উল্লেখিত না হওয়া এ দুয়ের পার্থক্য তো অবশ্যই বোঝা উচিত।

মুখতাসারুল কুদুরী, কানযুদ দাকাইক, আলবিকায়াহ এবং ফিকহে হানাফীর অন্যান্য 'মুতূন' ও 'মুখতাসারাত', যা সংক্ষিপ্ততার কারণে এবং পঠন-পাঠনের সুবিধার কারণে দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও আছে এগুলোতে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গে সনদ উল্লেখ করা হয়নি সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় হানাফী ইমামগণ পর্যন্ত, বিশেষত ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শাইবানী পর্যন্ত প্রত্যেক মাসআলার সনদ ফিকহের উৎসগ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে এবং ওইসব গ্রন্থেও রয়েছে যা 'মুতুন' শ্রেণীর গ্রন্থাদির 'শুরূহ' আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কুদুরী, 'কানয' ইত্যাদি 'মুতুন' বা 'মুখতাসারাত' শ্রেণীর গ্রন্থগুলো এজন্যই তৈরি হয়েছে যে, এতে মৌলিকভাবে ওইসকল মাসআলা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হবে যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শাইবানী (১৩২ হি.-১৮৯ হি.)-এর প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। এই কিতাবগুলো প্রতি যুগের ফিকহ ও ফতওয়া বিশেষজ্ঞদের কাছে, এমনকি অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছেও ফিকহে হানাফীর 'মুতাল্ক্কা বিল কাবূল' বা স্বীকৃত উৎসগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। সেই ছয় কিতাবের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

- ১. কিতাবুল আসল। এর অপর নাম আলমাবসূত। কিতাবটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুদ্রিত অবস্থায়ও রয়েছে।
- ২. আলজামিউস সাগীর।
- ৩. আলজামিউল কাবীর। (এই দু'টি কিতাব পূর্ণাঙ্গভাবে মুদ্রিত রয়েছে।)
- ৪. আসসিয়ারুল কাবীর, এ কিতাবটি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শরহু সিয়ারিল কাবীর সারাখসী (৪৮২ হি.)-এর সঙ্গে একীভূতভাবে মুদ্রিত হয়েছে।
- ৫. আসসিয়ারুস সাগীর। এ কিতাবটি আমাদের জানামতে এখনো অমুদ্রিত।
- ৬. আযযিয়াদাহ এ কিতাবটিও ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহুয যিয়াদাত কাযী খান (৫৯৩ হি.)- এর সঙ্গে একীভূতভাবে মুদ্রিত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ফিকহে হানাফীর শীর্ষস্থানীয় তিন ইমামের অন্যতম। অপর দুই ইমাম- ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। তাঁদের ফিকহী মাযহাব তিনি সরাসরি তাঁদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের ফিকহ ও হাদীস বিষয়ক সংকলন ও গ্রন্থসম্ভারও তাঁর কাছে ছিল। তাহলে যে মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর গ্রন্থাবলি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে এসব প্রশ্নের কী অর্থ থাকে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ও তাঁর দুই উস্তাদ পর্যন্ত এগুলোর সনদ কী?

আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা 'হিদায়া' সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে থাকেন যে, এ কিতাবের মাসায়েলের সনদ কোথায়? অথচ তারা যদি 'হিদায়া' পড়ে দেখতেন, তাহলে হয়তো এ প্রশ্ন করতেন না। হিদায়া হল হিদায়া গ্রন্থকার মারগীনানী রহ.-এর অন্য একটি রচনা 'বিদায়াতুল মুবতাদী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'বিদায়াতুল মুবতাদী'তে শুধু 'মুখতাসারুল কুদুরী' ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের 'আলজামিউস সাগীর'-এর মাসায়েল উল্লেখিত হয়েছে।

'মুখতাসারুল কুদুরী' কিতাবটি তো প্রত্যেক তালিবে ইলমের কাছেই রয়েছে, আলজামিউস সাগীরও আলহামদুল্লিাহ অনেক মাদরাসায় এসে গেছে। আজ থেকে এক শতাব্দী আগেই এই কিতাব হিন্দুস্থানে মুদ্রিত হয়েছে।

আলজামিউস সাগীর খুললেই দেখা যাবে, প্রত্যেক মাসআলার শুরুতে ইমাম মুহাম্মাদ সনদ উল্লেখ করেছেন। এই কিতাবের সকল মাসআলা ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে। এজন্য প্রত্যেক মাসআলার শুরুতে এই কথাটি রয়েছে-
محمد عن يعقوب عن ابى حنيفة
ইয়াকুব হল ইমাম আবু ইউসুফের নাম। তবে তিনি 'আবু ইউসুফ' উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

এবার কুদূরীর মাসআলাগুলোর প্রসঙ্গ।
আলজামিউস সাগীরের বাইরে যে মাসায়েল এই কিতাবে রয়েছে তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অপর পাঁচ কিতাব থেকেই গৃহীত। কোথাও কোনো মাসআলা অন্য কিতাব থেকে গৃহীত হলে তা হিদায়া বা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আজ আমাদের বন্ধুগণ এই প্রশ্ন তুলছেন যে, হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলোর সনদ আছে কি না? অথচ তারা যদি জানতেন যে শুধু সনদ নয়, সনদ বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও হানাফী ফকীহগণ যে কাজ সম্পন্ন করেছেন তা এই যে, ফিকহে হানাফীর মাসায়েলগুলোর মধ্যে কোন মাসআলা আইম্মায়ে মাযহাব থেকে বর্ণিত এবং কোনগুলো তাদের নির্ধারণকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে উৎসারিত, অর্থাৎ পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (যাদেরকে পরিভাষায় 'মুজতাহিদীন

ফিল মাযহাব ’ ‘আসহাবুত তাখরীজ ’ ও ‘আসহাবুত তারজীহ ’ বলা হয়) গবেষণা করে বের করেছেন তা নির্ণয় করা। এরপর যে মাসআলাগুলো আইম্মায়ে মাযহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে তা কি হুবহু এভাবেই বর্ণিত হয়েছে না মূল কথাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছিল এবং পরবর্তী যুগের ফকীহগণ তা ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারী কে ইত্যাদিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরপর ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসায়েলগুলোর বর্ণনাসূত্র কোন পর্যায়ের -কোন মাসআলাগুলো ‘মুতাওয়াতির ’ বা ‘মাশহুর ’ –এর সূত্রে বর্ণিত এবং কোনগুলো ‘খবরে ওয়াহিদ ’- এর সূত্রে এ বিষয়টিও নির্ণিত হয়েছে।

মুসতাখরাজ মাসায়েল অর্থাৎ ইমামগণের পরবর্তী ফকীহগণের গবেষণাকৃত মাসআলাগুলোর মধ্যে কোন মাসআলা কোন ফকীহের ইস্তেখরাজ বা গবেষণা এবং কোন গবেষণাগুলো গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে আর কোনগুলোতে আপত্তি হয়েছে এইসকল বিষয়ে ফকীহগণ আলোচনা করেছেন। এজন্য মাসায়েলের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এবং সেগুলোর বিভিন্ন পারিভাষিক নাম সৃষ্টি হয়েছে।যথা -‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ ’, ‘নাদিরুর রিওয়ায়াহ ’, ফাতাওয়াল মাশাইখ ইত্যাদি। ফকীহদের এই পরিশ্রম আলহামদুল্লিাহ বিনষ্ট হয়নি। একনো পর্যন্ত ‘শুরূহ ’ শ্রেণীর বিশদ গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের পর্যাপ্ত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আলমাবসূত, শাসৎমসুল আইম্মা সারাখসী (৪৮২ হি .) বাদায়েউস সানায়ে আলকাসানী (৫৮৭ হি .) ফাতহুল কাদীর শরহুল হিদায়া, ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি .) শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী লিল জাসসাস, শরহু মুখতাসারিল কারখী, লিল কুদূরী (৪২৮ হি .), আলবাহরুর রায়েক ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি .), রদ্দুল মুহতার ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি .), শরহুল জামিইস সাগীর, লিল জাসসাসসহ আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

প্রথমোক্ত তিনটি কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। এবং শেষোক্ত চারটি কিতাব ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন কুতুবখানায় ‘মাখতুত ’ (হস্তলিখিত) আকারে রয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত কপির ফটোকপি আলহামদুল্লিাহ মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা -এর গ্রন্থাগারেও বিদ্যমান রয়েছে। মূল গ্রন্থটি রয়েছে দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রোতে।

ফিকহে হানাফীর এমন কিছু রচরাও আছে , সেখানে পাঠকের সুবিধার্থে প্রত্যেক শ্রেণীর মাসায়েল আলাদা আলাদাভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম রযীউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি .)-এর আলমুহীতুর রাযাভী হল এধরনের একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে প্রতি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ ’ শ্রেণীর মাসায়েল, এরপর ‘নাদিরুর রিওয়ায়াহ ’ শ্রেণীর মাসায়েল, সবশেষে ‘ফাতাওয়াল মাশাইখ ’ শ্রেণীর মাসায়েল উল্লেখিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের পক্ষ থেকে ফিকহে হানাফীর সনদ সম্পর্কে উথ্থাপিত প্রশ্নের মূল্য কতটুকু তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের খামখেয়ালীর মূল কারণ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত নির্দেশনার অনুসরণ না করা, যা হাদীস শরীফে এভাকে এসেছে - ‘যখন তারা জানে না , তখন কোন জিজ্ঞেস করল না? না জানার সমাধান হল প্রশ্ন করা। ’

তৃতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়
ফিকহে হানাফীর সনদ বিষয়ে সর্বশেষ প্রসঙ্গ হল মাসআলার সনদ প্রসঙ্গ। অর্থাৎ হানাফী ইমামগণ যদি এই মাসআলাগুলো তাঁদের পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে সাহাবা ও ফুকাহায়ে তাবেয়ীন থেকে গ্রহণ করে থাকেন তবে সেই সনদ এবং কোথায় তা উল্লেখ আছে তা আলোচনা করা। যে মাসায়েল তারা পূর্ববর্তী ফকীহদের থেকে গ্রহণ করেছেন আর যে মাসায়েল নিজেরা বের করেছেন -এই উভয় ধরনের মাসায়েলের উৎস কী এবং শরীয়তের দলীল বিশেষত কুরআনে কারীম, সুন্নাতে নববী ও হাদীস শরীফের সঙ্গে এই মাসায়েলের সামঞ্জস্য কতটুকু এ বিষয়ে আলোকপাত করাই হল এ পর্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য।

আলহামদুল্লিাহ গবেষণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই পূর্ণ আস্বস্তির সঙ্গে বলতে পারি যে, ইসলামী ফিকহের অন্য সকল স্বীকৃত সংকলনের ন্যায় ফিকহে হানাফীর সংকলনটিও কুরআন -সুন্নাহ ও অন্যান্য শরয়ী দলীল থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়; বরং এ সংকলনটিও কুরআন-সুন্নাহরই ব্যাখ্যাতা। কুরআন -সুন্নাহর বিধি -বিধান এবং কুরআন - সুন্নাহর মূলনীতিসমূহের আলোকে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহেরই বিন্যস্ত রূপ এবং আলহামদুল্লিাহ সার্বিক বিবেচনায় ফিকহের অন্যান্য সংকলনের তুলনায় এ সংকলনটিই শরীয়তের দলীল বিষয়ক স্বীকৃত মূলনীতি
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن
এর সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত এজন্যই অন্যান্য সংকলনের তুলনায় এ সংকলনটিই অধিক সমাদৃত ও সর্বযুগে সর্বাধিক অনুসৃত। গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের এত প্রচেষ্টা ও অপপ্রচারের পরও এযুগেও এ সংকলনের গ্রহণযোগ্যতাই সবচেয়ে বেশি।

সংক্ষিপ্ততার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেল। তাই এ মৌলিক কথাটি বলেই এ সংখ্যার আলোচনা শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় ফিকহে হানাফীর সনদের এ পর্যায়টি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ। সে আলোচনায় আমাদের থেকে নিয়ে ফিকহ গ্রন্থাদির রচয়িতাদের পর্যন্ত এবং তাঁদের থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ. পর্যন্ত একটি ‘মুত্তাসিল সনদ ’ উদাহরণস্বরূপ পেশ করারও ইচ্ছা রইল।

আমি গত সংখ্যায় আরজ করেছিলাম, ফিকহে হানাফীর সনদ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হানাফী ইমামগণ এই ফিকহ কোথ্থেকে গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁরা এই ফিকহের স্রষ্টা বা উদ্ভাবক নন; তারা হলেন সংকলনকারী ও আহরণকারী। তাহলে ফিকহের যে অংশে তাঁরা সংকলক সেখানে দেখার বিষয় এই যে, কাদের সূত্রে এই

ফিকহ তাঁদের নিকট পৌঁছেছে এবং কীভাবে পৌঁছেছে। আর যে অংশে তাঁরা আহরণকারী সেখানে দেখার বিষয় এই যে , তাঁদের আহরণের উৎস ও পদ্ধতি কী ছিল।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বোঝার জন্য ফিকহে ইসলামী পরিচয় , ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। উপরোক্ত বিষয়গুলোতে ভালো ভালো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে আমার জানামতে সর্বাধিক বিস্তারিত ও ওজনী গ্রন্থ হল আল্লামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আলহাজভী রহ . (১৩৭৬ হি.) কৃত 'আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী '। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত। উর্দূ ভাষায় উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা খালিদ মাহমুদ (দা .বা .)-এর কিতাব 'আছারুত তাশরীইল ইসলামী ' একটি উচ্চাঙ্গের রচনা। আল্লাহ তা 'আলা যদি তাওফিক দান করেন তকে এ বিষয়ে একটি সারগর্ভ ও বিস্তারিত প্রবন্ধ আলকাউসারেও প্রকাশিত হবে।

বর্তমান আলোচনায় আমি কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

১. মুয়াররিখে ইসলাম ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ . (মৃত্যু : ৭৪৮হি.) বলেছেন, 'কুফা নগরীতে যেসব সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলী ইবনে আবী তালিব রা . ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা .। তাঁদের শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আলকামা রহ . (মৃত্যু : ৬২হি .)। তাঁর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী (মৃত্যু : ৯৬ হি .) এবং ইবরাহীম নাখায়ীর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সোলাইমান রহ. (মৃত্যু : ১২০হি .)। হাম্মাদ রহ . এর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আবু হানীফা (৮০হি .- ১৫০হি .) এবং আবু হানীফার শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আবু ইউসুফ রা . (মৃত্যু : ১৮৩হি .) আবু ইউসুফ রাহ .-এর শীষ্যগণ (দাবীন ও ইলমের প্রচার -প্রসারের জন্য) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (মৃত্যু : ১৮৯হি.)। আর তাঁর শীষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আশশাফেয়ী রহ . (১৫০ হি .-২০৪ হি .)। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। ' –সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫ /২৩৬ (হাম্মাদ ইবনে আবী সোলাইমান)

এখানে ইমাম যাহাবী রাহ . একটিমাত্র সূত্র উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সার কথা এই যে , ফিকহ ও ফতওয়া এবং তার উৎস কুরআন-সুন্নাহর ইলম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর ফকীহ সাহাবীগণ গ্রহণ করেছেন। এরপর তাঁরা এক দু 'জন করে কিংবা তাঁদের এক একটি জামাত এক এক ইসলামী শহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলের মানুষ দ্বীন - ঈমান, কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহ -ফতওয়ার ইলম তাঁদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ ফকীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।এঁদের 'ফুকাহায়ে তাবেয়ীন ' বলা হয়। এঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের তাকলীদ করত। এই ধারাবাহিকতায় ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমামদের যুগ এসেছে যারা ফিকহ -সংকলকরূপে মুসলিম জাহানে সমাদৃত। তাঁদের সংকলিত ফিকহ মোতাবেক গোটা মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত আমল করছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহ . 'ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন '-এর শুরুতে ফিকহ ও ফতওয়ার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ .ও 'সিয়ারু আলামিন নুবালা 'য় (খ: ৮ পৃ : ৯১-৯২; খ: ৯ পৃ : ৫২৫) সংক্ষিপ্ত আকারে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (৩১০ হি .) ও ইমাম ত্বহাবী (৩২১ হি .)-এর যুগ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করেছেন , যাঁরা তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। 'সিয়ারু আলামিন নুবালা 'য় ৮ম খন্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় তার আলোচনা এভাবে শুরু হয়েছে -
فالمقلّدون صحابة رسول الله (صَلّى الله عليه وسلم) بشرط ثبوت الاسناد اليهم، ثم أئمة التابعن...
তাঁর কথার সারমর্ম এই দাড়ায় যে , তার তালিকায় প্রতি যুগের যে ফকীহগণ উল্লেখিত হয়েছেন স্ব স্ব যুগে ও স্ব স্ব অঞ্চলে তাদের তাকলীদ হত এবং আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের তাকলীদ অব্যাহত রয়েছে।

২. ফিকহে ইসলামী (যার সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বাধিক সমাদৃত সংকলন হল ফিকহে হানাফী) বিশেষ কোনো যুগ বা বিশেষ কোনো ব্যক্তির উদ্ভাবন নয়। এটা নবী -যুগ থেকে তেমনি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে যেভাবে ফিকহের উৎস কুরআন -সুন্নাহ বর্ণিত হয়ে এসেছে।

৩. হাফিয যাহাবী রাহ . দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু একটি সনদ উল্লেখ করেছেন।যেখানে ইমাম আবু হানীফা রাহ . এর উস্তাদ হাম্মাদ রহ . এর নাম উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাম্মাদ রাহ .ই ইমাম আবু হানীফা রাহ .এর একমাত্র উস্তাদ নন। ইমাম আবু হানীফা রাহ . ফিকহ-ফতওয়া ও কুরআন-সুন্নাহর ইলম অসংখ্য উস্তাদ থেকে আহরণ করেছেন , যাদের অধিকাংশ ছিলেন তাবেয়ী এবং বিপুলসংখ্যক তাবেতাবেয়ী। বরং তিনি একাধিক সাহাবীর জিয়ারতও লাভ করেছিলেন। এই শত শত উস্তাদদের মধ্যে বিশিষ্ট সংখ্যক এমন ব্যক্তিত্বও ছিলেন যারা কুরআন -সুন্নাহর পারদর্শী এবং ফিকহ -ফতওয়ার ইমাম ছিলেন। যে জন্য তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য ছিলেন।

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসালেহী (৯৪২ হি .) (যিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ,) ইমাম আবু হানীফার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রচিত 'উকূদুল জুমান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ 'জম আবী হানীফাতান নু 'মান গ্রন্থে ইমাম আজমের অনেক উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন , যা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে পৃষ্ঠা ৮৭ তে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. কতজন সাহাবীর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ . পর্যন্ত কুরআন -সুন্নাহ এবং ফিকহ -ফতওয়ার ইলম পৌঁছেছে তা এ বিষয়টি থেকেও অনুমান করা যায় যে , ইমাম আবু হানীফা রাহ . যে নগরীর অধিবাসী ছিলেন এবং যে নগরীতে তিনি তাঁর

ইলমী জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন অর্থাৎ কুফা নগরী, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী অবস্থান করেছিলেন। ইমাম কাতাদা রহ. এর বিবরণ এই যে, এক হাজার পচিশজন সাহাবী কুফা নগরীর অধিবাসী হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে চব্বিশ জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। - কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা, দূলাবী ১/১৭৪

ইমাম আবুল হাসান ইজলী (২৬১ হি.) যাকে রিজাল শাস্ত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ.-এর সমকক্ষ গণ্য করা হয়, তিনি কুফা অধিবাসী সাহাবীর সংখ্যা আরও বেশি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী দেড় হাজার সাহাবী কুফা নগরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। – ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম ১/৪২

হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী রহ. (১৩৩৩ হি. -১৪২০ হি.) উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি উল্লেখ করার পর লেখেন, 'কুফা নগরীর আলিমগণের এরূপ জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল যে, খোদ কুফায় এত সংখ্যক সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অবিরাম মদীনায় সফর করতেন এবং সেখানকার বড় বড় সাহাবীদের সাহচর্য গ্রহণ করে জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন, 'আবু আবদুর রহমান সুলামী ও কুফার অন্যান্য আলিমদের যেমন, আলকামা, আসওয়াদ, হারিস, ও যির, ইবনে হুবাইশ (যাঁর কাছে সাতকারীর অন্যতম কারী আসিম ইবনে আবিন নাযূদ রহ. কুরআন মজীদ পড়েছেন)-এঁরা সবাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে কুরআন পড়েছেন (অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত শিখেছেন, কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং তার বিধান ও নির্দেশনার জ্ঞান লাভ করেছেন।) সঙ্গে সঙ্গে এঁরা মদীনা তাইয়িবা যেয়ে হযরত উমর রা. ও হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট থেকেও ইলম অর্জন করেছেন; এমনকি তাঁরা হযরত উমর রা. ও হযরত আয়েশা রা. থেকে যে পরিমাণ ইলম অর্জন করেছেন সেই পরিমাণ ইলম হযরত আলী রা. থেকেও অর্জন করেননি। কুফা নগরীর কাযী শুরাইহ রহ. ফিকহের তা'লীম অর্জন করেছেন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে ইয়ামানে।'- মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ৪/১৪২

কুফার মনীষীদের ইলমের সফরের বিষয়টি ছাড়াও 'ইলম-নগরীর দ্বার' হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা.-এর ইলম বিতরণের স্থানও ছিল কুফা। তিনি সেখানে চার বছর অবস্থান করেছেন। শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'তবে কুফার অধিবাসীরা হযরত আলী রা. সময়ে তো বটেই, হযরত উসমান রা. খলীফা হওয়ার আগে থেকেই কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী ছিলেন।' -মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৩৯

ইবনে তাইমিয়া রহ. আর লিখেন, 'কুফার অধিবাসীরা ঈমান, কুরআন, তাফসীরে কুরআন, ফিকহ ও সুন্নাহর ইলম, হযরত আলী রা. কুফা আসার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন।'

'হযরত আলী রা. কুফা আগমনের পূর্বে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা, হযরত আম্মার, হযরত আবু মূসা প্রমুখ থেকে দ্বীন হাসিল করেছিলেন। - মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৪২,১৫৭-ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস পৃ. ৩৭

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুফা নগরী কুরআন-সুন্নাহর ইলমের এত বড় কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা রাহ. এখানকার ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং অন্যান্য ইসলামী শহরের সাহাবীদের ইলম হাসিলের জন্যও গুরুত্বের সঙ্গে সফর করেছেন। কেননা, হতে পারে তাঁদের ইলমের কিছু অংশ কুফা নগরীতে পৌঁছয়নি। মুয়াখখিরে ইসলাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. পরিষ্কার লেখেন,

فإن الإمامابا حنيفة طلب الحدىث واكثر منه فى سنة مئة وبعدها

ইমাম আবু হানীফা রহ. একশ হিজরী ও তার পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে ইলমে হাদীস অনুসন্ধান করেছেন।' তিনি আরও লেখেন, وعنى بطلب الاثر وارتحل فى ذلك.

ইমাম আবু হানীফা হাদীস অন্বেষণে মনোযোগ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে সফর করেছেন।' - সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৯২-৩৯৬

তাছাড়া ১৩০ হি. থেকে ১৩৬ হি. পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ইমাম আবু হানীফা রহ. মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেছেন যা গোটা মুসলিম জাহানের ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। ইমাম আবু হানীফা রহ. 'ইমাম' হওয়ার পরও তাঁর নীতি এই ছিল যে, কুফা নগরীতে কোনো বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের আগমন হলে তার ইলম দ্বারা নিজের ইলমভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতেন। ইমাম নযর ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযী, যিনি ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ শীষ্যদের অন্যতম, বলেন যে, 'আমি হাদীস বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে অধিক যত্নবান আর কাউকে দেখিনি। একবার আমাদের এখানে ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া ও সায়ীদ ইবনে আবী আরুবা এলেন। তখন বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. আমাদের বললেন, দেধ তো তাঁদের কাছে এমন কিছু আছে কিনা যা আমরা শ্রবণ করতে পারি। -আল জাওয়াহিরুল মুযিয়া, আব্দুল কাদির কুরাশী ৩/৫৫৬

মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ ধরনের আরও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মোটকথা বিভিন্ন ইসলামী শহরের তাবেয়ীদের একটি সুবৃহৎ জামাতের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণ সাহাবায়ে কেরামের ইলম (কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ) হাসিল করেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তা হাসিল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে। তাঁর নির্দেশনা থেকে কিংবা তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনার গভীর থেকে। তাই এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণের সনদ একটি নয়; অসংখ্য। তবে ইমাম যাহাবী রহ. যে সনদটি উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমেই তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের সবচেয়ে বেশি ইলম হাসিল করেছেন। এ সনদের গোড়ায় রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা.।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর পর যে সাহাবীদের সূত্রে হানাফী ইমামগণের কাছে তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম সবচেয়ে বেশি পৌঁছেছে, কিংবা বলুন, ফিকহে হানাফীতে যাঁদের প্রভাব সর্বাধিক তাদের মধ্যে খলীফায়ে রাশিদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এবং হিবরুল উম্মাহ ওয়া তারজুমানুল কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য খলীফা আবু জাফর মনসূর (মৃত্যু ১৫৮ হি.) যখন ইমাম আবু হানীফাকে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কাদের কাছ থেকে এবং কাদের সূত্রে ইলম হাসিল করেছেন, তখন তিনি উপরোক্ত চার জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর জওয়াব শোনামাত্র মনসূরের যবান থেকে যে বাক্য উৎসারিত হয়েছিল তা এই -

بخ! بخ! استوثقت ما شئت يا ابا حنيفة، الطيبين الطاهرين المباركين، صلوات الله عليهم
‘মারহাবা ইয়া আবু হানীফা ! আপনি তো পরম নির্ভরযোগ্য পথ গ্রহণ করেছেন। এরা তো হলেন ‘তায়্যিব’ ‘তাহির’ মোবারক জামাত। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।’ –তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৪

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপরোক্ত চার সাহাবীকে, বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল সূত্র হিসেবে তাঁদের অগ্রগণ্যতা। অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় তাঁদের সূত্রেই ইমাম ছাহেবের কাছে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম সবচেয়ে বেশি পৌঁছেছে। অন্যথায় হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে ইমাম ছাহেবের সবচেয়ে ছোট রচনা ‘কিতাবুল আছার’ এবং তারও সবচেয়ে ছোট নুসখা, যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশশায়বানী রহ. বর্ণনা করেছেন, তাতেও উক্ত চার সাহাবী ছাড়াও আরও অনেক বড় বড় সাহাবীর হাদীস ও আছার বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.- এর উস্তাদ হাদীস-ফিকহ ও ইলমে বাতিনের ইমাম, আবু সায়ীদ খালাফ ইবনে আইয়ুব (মৃত্যু ২০৫ হি.) সত্যই বলেছেন,
‘ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছে, এরপর তা পৌঁছেছে তাঁর সাহাবীগণের কাছে, এরপর তাবেয়ীনের কাছে, এরপর আবু হানীফা ও তাঁর শীষ্যগণের কাছে। এখন যার ইচ্ছা সন্তুষ্ট থাকুক, যার ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হোক। - তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস পৃ. ৩৩-৩৬

খালাফ ইবনে আইয়ুব রহ. বক্তব্যে উদ্দেশ্য হল, ইমাম ছাহেবই সর্বপ্রথম তাঁর শাগরিদদের নিয়ে ইলমে ওহীকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিন্যাসে সুবিন্যস্ত করেছিলেন এবং ‘ফিকহে মুদাল্লাল’ ১ –এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ‘ফিকহে মুজাররাদ’ ২ –এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তিনি লেখেন,
من مناقب ابى حنيفة التى انفرد بها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابو ابا، ثم تبعه مالك ابن انس فى الموطأ، وسفيان الثورى فى جامعه، ولم يسبق ابا حنيفة احد.
‘যে বৈশিষ্ট্যগুলোতে ইমাম আবু হানীফা একক ও অপ্রতিদ্বন্দী তা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের ইলমকে সংকলিত করেছেন এবং বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিন্যস্ত করেছেন। এরপর ইমাম মালিক ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে তাঁর অনুসরণ করেছেন।’

৭- ‘ফিকহে মুতাওয়ারাছ’ (ফিকহের যে অংশ নবী-যুগ থেকে চলে আসছে) সংকলিত করা এবং সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পর যেসব নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ইমাম ছাহেবকে কী কী কাজ করতে হয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গে তিনি কী কী অবদান রেখেছেন তা আলোচনা করতে হলে একটি গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তাই আমি এখানে ইমাম ছাহেবের ভাষায় শুধু এ বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই যে, ফিকহ ও ফতওয়ার বিষয়ে তাঁর মৌলিক নীতিমালা কী ছিল। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ সনদে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে যে নীতিগুলো উল্লেখিত হয়েছে তার সারকথা এই :

১. মাসআলার সমাধান যখন কিতাবুল্লায় পাই তখন সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ করি।
২. সেখানে না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহীহ হাদীস আমাদের জন্য শিরোধার্য। একে পরিত্যাগ করে অন্যকিছুর শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।
৩. এখানেও যদি না পাই তবে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তগুলোর শরণাপন্ন হই।
৪. কিতাবুল্লাহ, সুন্নতু রাসূলিল্লাহ ও ইজমায়ে সাহাবার সামনে কিয়াস চলতে পারে না। তবে যে বিষয়ে সাহাবীগণের একাধিক মত রয়েছে সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যার মত কিতাব-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী বলে বোধ হয় তাই গ্রহণ করি।
৫. মাসআলার সমাধান এখানেও পাওয়া না গেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছে থাকি। তবে এক্ষেত্রেও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হই না।
-আলইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দিল বার পৃ. ২৬১, ২৬৪, ২৬৭; ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, আবু আব্দুল্লাহ আসসাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬ হি.) পৃ. ১০-১৩; তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী ১৩/৩৬৮; উকূদুল জুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালিহী পৃ. ১৭২-১৭৭; মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, মুয়াফফাক আলমক্কী ১/৭৪-১০০
‘ফিকহে মুতাওয়ারাছ’-এর সংকলন এবং ‘ফিকহে জাদীদ’ আহরণের যে নীতিমালা ইমাম ছাহেবের নিজের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকল ইমামের সর্বসম্মত নীতি। কোনো ফিকহ তখনি ইসলামী ফিকহ হতে পারে যখন তা উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সংকলিত ও আহরিত হয়।

ফিকহ সংকলন ও ফিকহ আহরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণে ইমাম ছাহেব কতটুকু সফল হয়েছেন তা তাঁর সমসাময়িক স্বীকৃত ইমামগণের বক্তব্য থেকে জানা যেতে পারে, যারা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি সকল ইসলামী শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. (মৃত্যু ১৬১ হি.) বলেন,
كان ابو حنيفة شديد الاخذ للعلم ، ذابا عن حرمالله ان تستحل ، يأ خذ بما صح عنده من الاحاديث التى كان يحملها الثقات، وبالاخر من فعل رسول الله (صَلَى الله عليه وسلم) ، وبما ادرك عليه علماء الكوفة.
‘আবু হানীফা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইলম অন্বেষণ করেছেন। তিনি ছিলেন (দ্বীনের প্রহরী) দ্বীনের সীমানা রক্ষাকারী, যাতে আল্লাহর হারামকৃত কোনো বিষয়কে হালাল মনে না করা হয় কিংবা হালালের মতো তাতে লিপ্ত থাকা না হয়। যে হাদীসগুলো তাঁর কাছে সহীহ সাব্যস্ত হত অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ বর্ণনা করে এসেছেন,

তার উপর তিনি আমল করতেন এবং সর্ববিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমলকে গ্রহণ করতেন। কুফার আলিমগণকে যে আমল ও ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন তিনিও তা থেকে বিচ্যুত হননি (কেননা এটাই ছিল সাহাবা -যুগ থেকে চলমান আমল ও ধারা)- আলইনতিক্বা , ইবনে আব্দিল বার পৃ . ২৬২; ফাযাইলু আবী হানীফা ; ইবনে আবিল আউয়াম পৃ.২২ (মাখতুত)

উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে যে ফিকহ সংকলিত হয়েছে তার মান ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় ইমাম শাফেয়ী রহ . –এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে

الناس عيال على ابى حنيفة فى الفقه ।

'ফিকহ বিষয়ে সকল মানুষ আবু হানীফা রহ .-এর কাছে দায়বদ্ধ। ' –তারীখে বাগদাদ ১৩ /৩৪৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩, তাহযীবুত তাহযীব ১০ /৪৫০
তিনি আরো বলেছেন, ما طلب احد الفقه الا كان عيالا على ابى حنيفة
'যে কেউ ফিকহ অন্বেষণ করবে তাকে আবু হানীফার কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করতেই হবে। ' –ফাযাইলু আবী হানীফা ; ইবনে আবিল আউয়াম পৃ.১৭
এই ফিকহের ভিত্তিই যখন হাদীস ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন হাদীস সুন্নাহর সঙ্গে এর সম্পর্ক কতখানি মজবুত হবে তা বলাই বাহুল্য। এজন্যই ইমাম ইবনুল মুবারক রহ . বলেছেন,
لا تقولو: رأى ابى حنيفة ، ولكن قولوا: تفسير الحديث.
(আবু হানীফার ফিকহকে) শুধু রায় বলো না , কেননা তা হাদীসের তাফসীর। ' –ফাযাইলু আবী হানীফা ; ইবনে আবিল আউয়াম পৃ . ২৩
ইসলামের বড় বড় ইমামগণ ইমাম আবু হানীফা রহ . –এর এই খিদমতের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুখারীর রহ . দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরাইবী রহ . তো এও বলেছেন, "মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হল নিজেদের নামাযে আবু হানীফার জন্য দুআ করা। কেননা , তিনি উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ ও ফিকহ সুরক্ষিত করে গিয়েছেন। " – তারীখে বাগদাদ ১৩ /৩৩৪; তাহযীবুল কামাল ; আবু হাজ্জাজ মিযযী ১৯ /১১০ ।

কেউ যদি ইমাম আবু হানীফার এই অবদানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তবে তার নেপথ্যে কারণ কি হতে পারে তা-ও তাঁর ভাষাতেই শুনুন

'আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উৎখাপনকারীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিছু লোক হিংসা -বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে অভিযোগ করে, আর কিছু লোক আছে যারা তাঁর সিদ্ধান্তগুলোর সুক্ষতা ও গভীরতায় পৌঁছতে না পেরে তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করে। আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলোকেই তুলনামূলক ভাল মনে হয়। ' -তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৬৭ ।

ইমাম আবু হানীফা রহ **.** পর্যন্ত সূত্র **-**পরম্পরা ।

এবার আমি পূর্বের ওয়াদা অনুসারে আমাদের থেকে ইমাম আবু হানীফা রহ . পর্যন্ত ফিকহের অসংখ্য সনদের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটি সনদ উল্লেখ করছি। সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে শুধু সনদের ব্যক্তিদের নাম ক্রমিক নাম্বার দিয়ে উল্লেখ করব। যাঁর নাম আগে আসবে তিনি হলেন শিষ্য আর যাঁর নাম পরে আসবে তিনি উস্তাদ।

ইলমে ওহীর ধারক-বাহকদের নিকট থেকে ইলমের আমানত গ্রহণ করার অনেকগুলো স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে , যেগুলোর আলোচনা উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিকহের কিতাবে রয়েছে। নিম্নোক্ত সনদের প্রত্যেকে তার উপরের ব্যক্তির নিকট থেকে সেই স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক পদ্ধতিতে ফিকহের ইলম ; বরং ফিকহের উৎস অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ইলমও অর্জন করেছেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ 'ইলমুল ইসনাদ ' বিষয়ক ওই কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোকে পরিভাষায় 'ছাবাত ' 'বারনামিজ ' 'ফিহরিছ ' 'মুজাম ' ও 'মাশীখা ' ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়। তদ্রূপ সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পরিচিতি এবং তাদের ইলমী ও আমলী জীবনের ইতিহাস আসমাউর রিজাল , তারাজীম , তুবাকাত ও তারীখের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। যদি আমি শুধু একটি সনদের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু লিখতে যাই তাহলে তা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে যাবে। এজন্য আপাতত শুধু সনদটিই উল্লেখ ক সমঝদার ও ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে। তবে সনদের অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব যেহেতু বিভিন্ন ফিকহের -গ্রন্থাবলির রচয়িতা তাই তাদের নামের সঙ্গে তাদের রচিত কিছু গ্রন্থের দিকেও ইঙ্গিত করব । এতে ফিকহের ঐ গ্রন্থগুলো পর্যন্ত আমাদের যে সনদ রয়েছে তারও একটি নমুনা সামনে এসে যাবে।

সনদঃ
আল্লাহ তা 'আলার বিশেষ অনুগ্রহে বর্তমান সময়ের অনেক ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে বান্দার (মুহা . আব্দুল মালেক ইবনে শামসুল হক কুমিল্লায়ী) ইলমে দ্বীন হাসিল করার তাওফিক হয়েছে। যাঁদের নিকট থেকে ফিকহ ও হাদীসের ইলম বেশি হাসিল হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ . (১৩৩৬হি. - ১৪১৭হি.) শায়খ রহ. জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত আছেন। আমি বরকতের জন্য তাঁর মাধ্যমেই সনদটি উল্লেখ করছি
১. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

২. মুহাম্মাদ যাহিদ ইবনুল হাসান আলকাউসারী
৩. ইবরহীম হাক্কী আল আকানী
৪. আলাউদ্দীন ইবনে আবিদীন আশশামী
৫. আমীন ইবনে আবিদীন আশশামী (‘রদ্দুল মুহতার’-এর গ্রন্থকার, যা ফাতওয়া শামী নামে প্রসিদ্ধ)।
৬. হিবাতুল্লাহ আল বা’লী
৭. সালিহ ইবনে ইবরাহীম আলজীনীনী
৮. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলমাকতাবী
৯. আব্দুল গাফফার মুফতিল কুদস
১০. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলগাযযী (‘তানবীরুল আবসার’-এর গ্রন্থকার)
১১. যাইন ইবনে নুজাইম (‘কানযুদ দাকাইক’-এর ভাষ্যগ্রন্থ ‘আলবাহরুর রায়েক’-এর গ্রন্থকার
১২. আহমদ ইবনে ইউনুস ইবনুশ শিলবী (শরহুল কানয-এর গ্রন্থকার)
১৩. আব্দুল বার ইবনুশ শিহনাহ (শরহুল ওয়াহবানীয়্যাহ-এর গ্রন্থকার)
১৪. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফতহুল কাদীর’-এর গ্রন্থকার)
১৫. সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী কারিউল হিদায়া
১৬. আকমালুদ দ্বীন মুহাম্মাদ আলবাবারতী (‘আলইনায়াহ’-এর গ্রন্থকার)
১৭. কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকী (‘মিরাজুদ্দিরায়া’- গ্রন্থকার)
১৮. আলহাসান ইবনে আলী আসসিগনাক্বী
১৯. হাফিযুদ্দীন আবুল বারাকাত আননাসাফী (‘কানযুদ দাকাইক’-এর গ্রন্থকার)
২০. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সাত্তার আলকারদারী
২১. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী আলমারগীনানী (হিদায়া- গ্রন্থকার)
২২. নাজমুদ্দীন উমর আননাসাফী
২৩. খালাফ ইবনে আহমদ আদদারীর
২৪. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আদ্দামাগানী
২৫. আবুল হুসাইন আলকুদুরী (‘মুখতাসারুল কুদুরী’-এর গ্রন্থকার)
হিদায়া গ্রন্থকার (২১ নম্বরে উল্লেখিত) আবুল হাসান আলমারগীনানী-এর অনেক উস্তাদের আরেকজন হলেন আসসাদরুশ শাহীদ উমর ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে মাযাহ । (ইনি ‘আল মুহীতুল বুরহানী’ রচয়িতার মুহতারম পিতৃব্য ।)
তিনি তাঁর পিতা বুরহানুল আইম্মা আব্দুল আযীয ইবনে মাযাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন । তিনি রেওয়ায়েত করেন শামসুল আইম্মা আসসারাখসী থেকে, যিনি আলমাবসূত শরহু মুখতাসারিল হাকিম - এর রচয়িতা । শামসুল আইম্মা আসসারাখসী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ হলেন শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী ।
হিদায়া গ্রন্থকারের উস্তাদ নাজমুদ্দীন উমর আননাসাফী (২২ নাম্বারে উল্লেখিত)-এর উস্তাদগণের সংখ্যা হল পাঁচশত পঞ্চাশ জন, যাদের পরিচিতি বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন । সনদের সামনের অংশ তার একজন উস্তাদ আবুল ইউসর সদরুল ইসলাম বাযদাভী-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছি ।
২৩. আবুল ইউসর সদরুল ইসলাম আলবাযাদী
২৪. ইসমাঈল ইবনে আব্দুস সাদিক আলবিয়ারী আলখতীব
২৫. আব্দুল করীম আলইয়াযদী
২৬. আবু মানছুর আল মাতুরীদী
২৭. আবু বকর আলজুযজানী
২৮. আবু সুলাইমান আলজুযজানী
২৯. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী
৩০. ইমাম আবু হানীফা
উল্লেখিত আবুল ইউসর সদরুল ইসলাম বাযদভী (২৩) এবং শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী অন্যতম । তার মাধ্যমে আর একটি সনদ এই-
২৪. শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানী
২৫. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হামদান
২৬. আবু ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবনে সাইদ আলবায়দভী
২৭. আবু জাফর আতত্বহাবী (ইমাম ত্বাহাবী)
২৮. বাক্কার ইবনে কুতাইবা আলবাসরী
২৯. হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া আলবাসরী
৩০. আবু ইউসুফ আলকাযী ও যুফার ইবনুল হুয়াইল আলবাসরী (এই দুই মনিষী ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ শিষ্য) ইমাম আবূ হানীফা রহ. যে উস্তাদগণের নিকট থেকে কুরআন-হাদীসের ইলম সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহচর্য গ্রহণ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ.-এর ।
৩১. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান
৩২. ইবরহিম আননখয়ী
৩৩. আসওয়াদ, আলকামাহ ও আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী প্রমুখ ।
৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উমর ইবনুল খত্তাব রা. আলী ইবনে আবী তালিব রা. আয়েশা সিদ্দীকাহ রা. সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ।
এঁরা ইলমে ওহী অর্জন করেছেন খাতামুন্নাবিয়ীন, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, যার সম্পর্কে স্বয়ং রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছন

وَماَ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاَّ وحْىٌ يُوحَى

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি যে, রাব্বুল আলামীন যখন শুধু তার ফযল ও করমে বরকতময় নূরানী সুত্রের সঙ্গে এবং এর মত অন্যান্য সুত্রগুলর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যাঁদের মাধ্যমে আমরা কুরআন-হাদীস-সুন্নাহ এবং তা থেকে আহরিত ইলম বর্ণনা করে থাকি, তখন এই সুত্রের মর্যাদা রক্ষারও তাওফীক তিনি আমাদের দান করুন এবং এই নূরানী কাফেলার আখলাকে নিজেদের আখলাক গঠন করার তাওফীক দিন, যা ছিল নবী-আখলাকেরই প্রতিচ্ছবি। এবং শুধু নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর উপর অবিচল রাখুন।

বি.দ্র. উল্লেখিত সনদ এবং অন্যান্য সনদ সম্পর্কে জানার জন্য 'আছবাত' ও 'ত্ববাকাতুল ফুক্কাহা বিষয়ক গ্রন্থাদি এবং ফিকহের বিশদ গ্রন্থাবলির মুকাদ্দিমা ও খাতিমা অংশ পড়তে হবে। উল্লেখিত সনদের জন্য বিশেষভাবে 'আততাহরীরুল ওয়াজীয', 'তাকমিলাতু রাদ্দিল মুহতার' 'রদ্দুল মুহতার, 'উকূদুল লাআলী', 'আলজাওয়াহিরুল মুযীআ', এবং 'আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা' ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্য নেয়া যাবে। শেষোক্ত গ্রন্থ দু'টিতে সনদ উল্লেখিত ফকিহগণের তরজমা মনোযোগের সহিত পড়া জরুরী।

والا لا يتبن مواضع السقط والتحريف التى نشأت لأخل غفلة الناسخن والطابعن